এক বিয়ের পরের গল্প

শওকত আলী

অফিস থেকে দুপুরের দিকে টেলিফোনটা আসে। ফোন করেছিলো জুনিয়ার এক রিপোর্টার বিভু- বিভুরঞ্জন গুহ। বলেছিলো, আপনার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কি বিকেলে বাসায় থাকবেন? না কি বাইরে কোথাও যাবেন?

জবাবে বলেছিলেন, না কোথাও যাবো না, আজ আমার অফ ডে তুমি জানো না। ছুটির দিনে আমি কোথাও যাইটাই না- অফ ডেটা আমি পুরোপুরি অফ রাখি।

হাসতে হাসতে জানতে চেয়েছিলেন, তা আমার বন্ধুটি কে? নাম বলছো না কেন?

ঐ সময় বিভুর গলার স্বরে কৌতুক বেজে উঠেছিলো। বলেছিলো- সেটা আপনি বন্ধুর মুখোমুখি হলেই জানতে পারবেন- আর খুশিও হবেন- একেবারেই অপ্রকাশিত একটা ব্যাপার ঘটবে- পুরনো বন্ধু, মানে একেবারে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হলে কে না খুশি হয়, বলুন?

বিভুর কাছ থেকে অমন কথা শোনার পর বেশ অবাক লাগে শাহিদ হাসানের। বলেন, আমার বন্ধুটি যদি দেখা করার জন্য আসতে চান, তাহলে এখনই তো আসতে পারেন, বিকেল পর্যন্ত দেরি করা কেন?

সেটাই তো সমস্যা স্যার, বিভু বলে, উনি তো একা যেতে পারবেন না- ঢাকা শহরে প্রথম এসেছেন। পথঘাট ভালো করে চেনেন না, তাই আমাকেই নিয়ে যেতে হবে- এদিকে আমাকে এখনই একটা অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হচ্ছে, হোম মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্স- লাঞ্চের পর। তার মানে এখনই বেরুতে হবে। শেষ হতে হতে সাড়ে তিনটা-চারটা তো অবশ্যই বাজবে- সেই মতো হিসাব করেই টেলিফোন করতে হচ্ছে, তা স্যার আমি আপনার বন্ধুকে নিয়ে আসছি বিকেলে- ওঁকে আপনার কাছে রেখে আমি চলে যাবো অফিসে রিপোর্ট লিখতে- তারপর আবার ওঁকে এসে নিয়ে যাবো।

শাহিদ হাসান ঠিক আছে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখেন। ততক্ষণ তাঁর মনের ভেতরে কৌতূহলের খোঁচাখুঁচি শুরু হয়ে গেছে। বারবার মনে প্রশ্ন জাগছে- কে হতে পারে লোকটা? যে তাঁর বাল্যবন্ধু? যে ঢাকা শহরে প্রথম এসেছে, পথঘাট চেনে না এমন বন্ধু কি তাঁর আছে?

মনের ভেতরে ঐ প্রশ্নের জবাব না পেয়ে যখন হয়রান অবস্থা তাঁর, ঐ সময় কাজের মেয়ে এসে তাগিদ দেয়। বলে, নানা ভাই, গোসল করেন না ক্যান? একটা তো বাইজা গেছে, ভাত খাইবেন না?

কাজের মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে এই এক মুশকিল, দেয়াল ঘড়ির দিকে যেন নজর আটকে রাখে। আটটার সময় নাশতা, একটার সময় দুপুরের ভাত, রাতের খাবার নয়টায়। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সময়ের হিসাব ওর। তবে মেয়েটাকে দোষ দিতে পরেন না। যাবার সময় তাঁর মেয়ে মুকুল বারবার করে বলে গেছে, সে যেন ওর বাবার দিকে সব রকম খেয়াল রাখে, চা-নাশতা ভাত খাওয়ার ব্যাপার তো রয়েছেই। এমনকি কখন কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে, তাও বলে রেখেছে।

বসিরনের তাগিদ এড়াতে পারেন না। তাই স্নানের ঘরে যেতে হয়- নাহলে স্নানের গরম পানি ঠান্ডা হয়ে যাবে।

স্নান সেরে চুলটুল আঁচড়ে খাবার টেবিলে বসতে হয়। এখানেও বসিরনের নজর- হাত বাড়িয়ে কোনো বাটি থেকে তরকারি নিতে যাবার আগেই বসিরনের হাত চামচে করে সেই তরকারি পাতে তুলে দেয়।

দুটোর মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়। তারপর রোজকার মতো বসার ঘরে সোফায় গিয়ে বসেন এবং খবরের কাগজ সামনে মেলে ধরেন। খবর টবর সকালেই দেখা হয়ে গেছে। এখন সম্পাদকীয়গুলো পড়ার কথা। কিন্তু পড়া আর হয় না, মনের ভেতরে সেই প্রশ্ন আবার জেগে ওঠে, কার কথা বললো বিভু? তাঁর কোনো বাল্যবন্ধু দেখা করতে আসবে? এমন কোনো বন্ধু কি তাঁর আছে, যে পথ চিনে তাঁর বাসায় আসতে পারবে না? ওয়ারী এলাকাটা পুরনো ঢাকায় হলেও ঘিঞ্জি বস্তি তো নয় যে, ঠিকানা জানা সত্ত্বেও পথ চিনে আসতে পারবে না? পুরনো বন্ধু হলে কেন পারবে না? এ বাড়িতে তো আছেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে- তাঁর নতুন পুরনো সব বন্ধুরই তো জানা যে তিনি নিজের বানানো বাড়িতে বসবাস করে আসছেন।

তাহলে কে হতে পারে সেই বন্ধু? মনের ভেতর থেকে বারবার উঠে আসা প্রশ্নটাকে কিছুতেই সরিয়ে রাখতে পারেন না। সোফা ছেড়ে শোয়ার কামরায় গিয়ে বিছানায় ঠাঁই নেন। কিন্তু লাভ হয় না। চোখ বুজে পড়ে থাকাই সার হয়, ঘুম আর আসে না। খালি ঘুরে ফিরে ওই এক প্রশ্ন কে সেই লোক যে ছেলেবেলার বন্ধু ছিলো? কোন ছেলেবেলার? যখন একেবারেই বালক বয়স? যখন হুগলিতে থাকতো? নাকি কিশোর কালের বন্ধু, যখন মোহনপুরে নিজেদের আদিবাড়িতে ছিলেন? ইস্কুলে ওপরের দিকের ক্লাসে পড়তেন?

বিছানায় থাকতে পারেন না, আবার গিয়ে সোফায় বসেন, আবার খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরেন। কিন্তু পড়তে পারেন না- বাইরের সামান্য কোনো আওয়াজেই কান পাতেন, গেটের দরজায় কেউ নক করছে না তো?

যখন প্রায় চারটা বাজে তখন অফিসে টেলিফোন করেন- কিন্তু বিভুকে পান না। ওখান থেকে একজন খবর দেয় যে, বিভুরঞ্জন মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স থেকে ফেরেননি- ও এলেই আপনাকে ফোন করতে বলবো।

টেলিফোনে ওই কথা শোনার পর নিজের ওপরই তাঁর রাগ হতে থাকে। কেন তিনি খামাকা এতো অস্থির হচ্ছেন? কে-না-কে একজন আসবে তাঁর বন্ধুর পরিচয় ধরে, আর সে জন্য তাঁকে অস্থির হতে হবে? এর কোনো মানে হয়?

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দাগও পার হয়ে যায়। যখন ভাবতে শুরু করেছেন যে, কাল অফিসে প্রথমে বিভুকে নিজের কামরায় ডেকে কষে ধমক লাগাবেন, ঠিক ওই সময় গেটের কলিং বেল বেজে ওঠে। নিচে গেটের বাইরে থেকে বিভুর গলা শুনতে পান। সে দরজা খোলার জন্যও অপেক্ষা করতে যেন চায় না। বলে, শাহিদ ভাই আপনার বন্ধুকে দিয়ে গেলাম আমি আর ওপরে যাচ্ছি না। আমাকে প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্টটা ডিটেইল লিখতে হবে- বোঝেনই তো মিনিস্টারের বক্তব্য এমনিতেই লম্বা হয়ে থাকে। তার ওপর উনি আবার হোম মিনিস্টার।

শাহিদ হাসান দরজা খুলে দাঁড়িয়ে নিচে সিঁড়ির মুখে নজর রেখে তাকিয়ে ছিলেন বন্ধুর অপেক্ষায়। দেখতে পান, একজন পাকা চুলের ভদ্রলোক ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। মুখোমুখি হলে শাহিদ হাসানকে দাঁতহীন মুখের একটা হাসি উপহার দেন। বলেন, কেমন আছিস তুই? ভালো? আমাকে চিনতে পারছিস?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন না শাহিদ হাসান। ভদ্রলোকের মুখের দিকে নজর মেলে রেখে পুরনো স্মৃতি হাতড়াতে থাকেন।

কী হলো? ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলেন, পুরনো স্মৃতির ভাঁড়ারেও আমাকে খুঁজে পাচ্ছিস না? একদম মনে পড়ছে না? জন্মস্থানের কথা ভুলে গেছিস? মোহনপুরের স্কুলের কথাও মনে পড়ে না?

একটু থেমে আবার বলেন ভদ্রলোক, আরে মন খারাপ কেন করিস, ওটা দোষের কিছু নয়, পঞ্চাশ- বাহান্ন বছর ধরে সময়ের ধুলো পড়ার পর কি সহজে সেই স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়?

কথা বলার সময় কেমন একটা কৌতুকের টান শোনা যায় ভদ্রলোকের গলার স্বরে। আর তাতেই স্মৃতির একটা দিক হঠাৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে শাহিদ হাসানের মুখ দিয়ে একটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে পড়ে। বলেন, দিব্য, তুই! এখানে? কবে এসেছিস?

বাল্যবন্ধুকে দু'হাতে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরেন শাহিদ হাসান। ওই সময় দু'জনের মুখ দিয়ে যে কতো কথা বেরুতে থাকে তার ঠিক ঠিকানা বা অর্থ-অনর্থের দিকে খেয়াল কারুরই থাকে না।

ঘরের ভেতরে এনে সোফায় বসান দিব্যকে, এখন পুরো নামটাই মনে পড়ছে- পুরো নাম ওর দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন, বয়স বাড়িয়েই চুল পাকিয়েছিস সেটা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু ভুরু দুটো কীভাবে পাকালি? আর দাড়ি- গোঁফের কী অবস্থা?

ওদিকের অবস্থা তোদের দেখাতে চাই না, তাই ওসব বালাই রাখিনি।

একটু থেমে বন্ধুর দিকে পালটা তাকিয়ে বলেন দিব্যেন্দু, তোরও তো দেখছি একই অবস্থা চুল-দাড়ি-গোঁফা সবই পেকেছে আর সেগুলো দেখবার জন্য রেখেও দিয়েছিস?

হ্যাঁ, কী করবো বল? চোখের নজর ভালো চলে না, তাই নিজের হাতে শেভ করতে পারি না- প্রথম কিছুদিন সেলুনে যেতাম, কিন্তু পরে ভীষণ বিরক্তি লাগতে শুরু করলো- তাই এখন কম যাই- তাই গাল মুখের আবাদটা ভালো মতোই হয়ে যায়।

হাসতে হাসতেই বলেন শাহিদ, তো বাদ দে ওসব ছেলেমানুষি। বিকেলের চা-টা খেয়েছিস?

না, কিছু খাইনি, দিব্যেন্দু বলেন, তোর বাসায় আসছি, তো খেয়ে কেন আসবো?

তাহলে কী খাবি, বল? চা, না কফি?

বিখ্যাত সাংবাদিক শাহিদ হাসানের বাড়িতে ছেলেবেলার বন্ধু প্রথম

এসেছে, সে কি শুধু চা কফি খাওয়ার জন্য?

বন্ধুর কথায় আরেক প্রস্থ হাসি উথলে ওঠে। শাহিদের মনে পড়ে দিব্যেন্দুর ছেলেবেলা থেকেই দারুণ বুদ্ধি, ওর সঙ্গে কেউ কথায় পেরে উঠতো না- সেই তুলনায় এখন যেন অনেক বেশি মিইয়ে গেছে ও।

শাহিদ হাসান জিজ্ঞেস করেন, তুই কি রিটায়ার করেছিস? কলেজে চাকরি করতিস, সে খবরটা শুনেছিলাম- সেও মুক্তিযুদ্ধের সময়, মোহনপুরে যারা গিয়েছিলো এদিক থেকে তাদের মুখেই শুনেছিলাম তোর কথা, যে দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত কলেজের একজন নামকরা প্রফেসর, কলকাতার মগবাজারে বাড়ি করেছে।

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দু হাসেন। বলেন, আমিও তোর কথা শুনেছি, তখনই, ওদের কাছ থেকেই, যে শাহিদ হাসান ঢাকায় খুব নামকরা সাংবাদিক হয়েছে- কিন্তু তুই একবারও গেলি না কেন, বল তো? দু'বছর আগে তোর ছোট ভাই নাহিদ গিয়ে ঘুরেফিরে এলো- তোর বড় ভাই জাহিদদাও একবার না দু'বার গিয়েছিলেন, কিন্তু তুই কেন যাসনি? মোহনপুরের লোকদের ওপর তোর খুব রাগ, তাই না?

আরে না, তা নয়, শাহিদ হাসান বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে চান। বলেন, এমনিতেই যাওয়া হয়নি- আর কি? যাবো যাবো করে তৈরিও হয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি-

কিন্তু কলকাতায় তো গিয়েছিলি, দিব্যেন্দু স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন, খবরটা নাহিদের মুখেই আমি শুনেছি।

শাহিদ ধরা পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, হ্যাঁ গিয়েছিলাম- কিন্তু ও, মানে নাহিদই থাকতে দেয়নি। ভেবেছিলাম, চিকিৎসাটিকিৎসা শেষ করে একবার মোহনপুরেও ঘুরে আসবো, কিন্তু ও-ই তো থাকতে দেয়নি- লন্ডন থেকে টেলিফোনের পর টেলিফোন, আমার চিকিৎসা ও-ই করাবে লন্ডন ব্রিজ হাসপাতালে সব ব্যবস্থা নাকি করে রেখেছে- এইসব কথা ও বোঝায় ওর ভাবীকে, মানে আমার ওয়াইফকে- আর তাতেই লন্ডনে যেতে হলো, ঢাকায় না ফিরে কলকাতা থেকে সরাসরি লন্ডন।

নাহিদের কথা ওঠাতেই দিব্যেন্দু একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেটা শাহিদের নজর এড়ায় না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সরাসরি জানতে চান, তা তুই হঠাৎ ঢাকায়? কবে এসেছিস? উঠেছিস কোথায়?

দিব্যেন্দু জোর করে যেন হাসেন। বলেন, হ্যাঁ হঠাৎ বলতে পারিস- তোর কি মনে আছে যে আমাদের আদিবাড়ি ছিলো মানিকগঞ্জ? অনেক দিনের সাধ জন্মভূমিটা দেখে যাবো- আমার ওয়াইফেরও ইচ্ছে ছিলো, ওরও জন্ম তো এখানেই- মানে ধামরাই এলাকায়-

বৌদিও কি এসেছেন? শাহিদ কৌতূহলী হন।

না, ও আসেনি- পরেরবার আসবে।

মানিকগঞ্জে কি তোদের সেই বাড়িঘর আছে এখনো? শাহিদ হাসান জানতে চান।

আরে নাহ্। দিব্যেন্দুর মুখে করুণ হাসি ফোটে। বলেন, তাই নাকি থাকে! মোহনপুরেও তোদের বাড়ির কোনো চিহ্ন এখন খুঁজে পাবি না- নাহিদ গিয়ে তো ফটো তোলার জন্য খুঁজে খুঁজে হয়রান- শেষে আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। তোদের বাড়িসুদ্ধ পুরো জায়গাটা যে কতো টুকরো ভাগ হয়েছে তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না- তবে একটা আমগাছ এখনো আছে- নাহিদ ওই আমগাছটারও ফটো তুলেছে, কেন তোকে ওসব ফটো দেখায়নি? আমাদের এখানকার বাড়িঘরেরও ওই একই অবস্থা- কোনো চিহ্ন নেই- পিসীর ছোট ছেলে বিধানই শুধু আছে- ও ঢাকায় চাকরি করে। তবে মানিকগঞ্জের বাড়িতে একটা আশ্রম করেছে- ওখানে পূজাপাট হয়- ঠাকুরের নামকীর্তন করে বোষ্টমরা-বিধান প্রত্যেক সপ্তাহে যায়- ওই ট্রাডিশনটা বজায় রেখেছে- আমি বিধানের ঢাকার বাসাতেই উঠেছি- ওদের ওখানেই বিভুর সঙ্গে পরিচয়, ওর কাছেই তোর খোঁজ পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাকে নিয়ে এলো।

তুই গিয়েছিলি? শাহিদ কৌতূহলী হন।

কোথায়?

কোথায় আবার? মানিকগঞ্জ?

বন্ধুর পাল্টা প্রশ্নে দিব্যেন্দু কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, হ্যাঁ গিয়েছিলাম, এই তো পরশু দিন ঘুরে এসেছি।

তারপর?

এই তো আছি, দিব্যেন্দু অদ্ভুত রকমের নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেন। তোর ঠিকানা খুঁজে বের করতেই দু'দিন লেগে গেলো- তুই জার্নালিস্ট হয়েছিস সেটা জানতাম, কিন্তু কোন কাগজে আছিস সেটা জানা ছিলো না- সাধনের কাছে জানতে চাইলে ও বিভুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়- তারপর এই তো তোর মুখোমুখি বসে কথা বলছি?

আরো কিছুদিন আছিস তো?

না, দিব্যেন্দুর বুকের ভেতর থেকে একটা যেন লম্বা নিঃশ্বাস বের হয়। বলেন, কিছু কাজ ফেলে এসেছি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরতে হবে-

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মতো করে আবার বলেন দিব্যেন্দু, আচ্ছা কবিরও নাকি ঢাকায় আছে?

হ্যাঁ আছে, ও ভালো উকিল হয়েছে- হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে, শাহিদ জানান। তারপর বলেন, কেন, ওর সঙ্গে দেখা করবি?

কবির উদ্দিনের কথা উঠলে আব্দুল কাদিরের নামও উঠে আসে- তারপর ফের কিশোরকালের নানান স্মৃতির মধ্যে ফিরে যান দু'বন্ধু। আর তখনই শাহিদ হাসানের মনে হয়, দিব্যেন্দু যেন থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। কথা বলতে বলতেই কয়েকবারই শাহিদ হাসান বন্ধুর মুখে চোখে ওই ভাবটা লক্ষ্য করেন। শেষে বলেই ফেলেন। বলেন, তুই মনে হচ্ছে কিছু যেন চিন্তা করছিস?

হ্যাঁ, একটা সমস্যা হয়েছে, দিব্যেন্দু মুখ নিচু করে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলেন। তারপর মুখ তুলে বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তুই কি মনসুর হোসেন নামে এক ভদ্রলোককে চিনিস? গভমেন্ট কলেজে প্রফেসর ছিলেন, এখন বোধহয় রিটায়ার করেছেন- চিনিস তুই?

শাহিদ হাসান হেসে ওঠেন। বলেন, শুধু ওইটুকু জানলে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? ঢাকার সিটিতে কতোগুলো সরকারি কলেজ, তাছাড়া সাবজেক্ট কী, কোন কলেজে ছিলেন, এসব জানতে হবে না?

হ্যাঁ, তা তো বটেই- দিব্যেন্দু চিন্তিত মুখে বলেন, ওঁর কাছে আমার একবার যাওয়া দরকার-

তাহলে কলেজগুলোতে গিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।

তোর জানাশোনার মধ্যে মনসুর নামে কোনো প্রফেসর নেই?

বাহ কেন থাকবে না, শাহিদ হাসান হেসে ওঠেন। বলেন, ও নামটা তো খুবই কমন- কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে, এমনকি জার্নালিজম করতে এসেও কতো মনসুরের সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে, তার হিসাব বলতে পারবো না।

স্মরণ করতে করতে দিব্যেন্দু বলেন, মনে হয় ম্যাথমেটিক্স-এর প্রফেসর ঢাকা কলেজেই ছিলেন বহুদিন ধরে।

শাহিদ হাসানের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়কার বন্ধু মনসুরকে মনে পড়ে, এফএইচ হলএ পাশের রুমে থাকতো। বলেন, ওদের দেশের বাড়ি কি বগুড়ায়?

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ান খুব ধীরে, বলেন সেটা ঠিক জানি না- ওদিকেরই কোথাও হতে পারে। তবে মোহাম্মদপুরে সলিমউল্লাহ রোডে নিজের বাড়ি করেছেন আর ওখানেই থাকেন, এটা জানি।

শাহিদের মনে আর সন্দেহ থাকে না। বলেন, এবার চিনতে পেরেছি, তুই তালুকদার মনসুরের কথা বলছিস- আমাদের ব্যাচেরই ছাত্র, হলে পাশের রুমে থাকতো- বন্ধুত্বও হয়েছিলো অল্প স্বল্প- তো এখন বহুদিন হলো দেখা সাক্ষাৎ নেই- কিন্তু কেন? তোর কী দরকার পড়লো মনসুরের সঙ্গে?

দিব্যেন্দুর চোখের মুখের ভাব একটু যেন করুণ হয়ে ওঠে। নজর ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।

কী ব্যাপার? শাহিদ রীতিমতো অবাক হন। বলেন, কী হলো তোর?

মনসুরকে কেন দরকার বলবি তো?

হ্যাঁ বলবো, দিব্যেন্দু মনের আবেগ চেপে রেখে বলেন, এই বয়সে বড় দুঃখের মধ্যে আছি ভাই- ভারি কষ্ট বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আর বলিস না দিব্যেন্দু বলেন, আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে-ছেলেটা সোভিয়েট স্কলারশিপ পেয়ে মস্কোর এক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলো। তারপর আর ফেরেনি- ওখানেই বিয়ে করে ওখানেই শেটেল্ড- চিঠিপত্র লেখে না, বছরে একবার কি দু'বার শুধু টেলিফোন করে। আর মেয়েটা ভালো ছাত্রী ছিলো, ক্যালকাটা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস করে- খুবই অ্যামবিশাস, এমআরসিপি করার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলো- ওটা তো সরাসরি করা যায় না- আগে একটা পরীক্ষায় পাস করতে হয়- ওটাকে প্ল্যাব বলে- ওটা পাস করলে তারপর এমআরসিপিতে সিলেকশান পাওয়া যায়- মন্দি, মানে আমার মেয়ে মন্দিরা, ওখানে ওর মাসীর কাছে উঠেছিলো- ওখানে থেকেই পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তখনই পরিচয় হয় মঞ্জুর হোসেন নামে বাংলাদেশের একটি ছেলের সঙ্গে, ছেলেটি ওকে সাহায্যও

করতো- সে আবার তোর ভাই ডাক্তার নাহিদেরও পরিচিত- মন্দিকে ও-ই নিয়ে যায় নাহিদের বাসায়। বছর খানেক যেতে না যেতেই দু'জনের জানা শোনা বেশ গাঢ় হয়ে যায়- শেষে ওরা বিয়ে করে নেয়- আমাদের জানালে আমরা আপত্তি জানাই, তবু। প্রথম দিকে খবরটা গোপন রাখে। কিন্তু এসব খবর কি গোপন থাকে? ওর মেসো, মানে আমার ভায়রা খবরটা আমাদের জানায়- কারণ মন্দি তখন ওর মাসীর বাড়ি ছেড়ে নিজেদের ভাড়া করা বাসায় চলে গিয়েছিলো। আমরা যখন জানতে পারি, তখন আর করার কিছুই ছিলো না- অবশ্য কিছু করতে পারতামও না- তখন আর কি করি। ওদের বিয়ে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ওদের আমরা কলকাতায় আসতে বলি- আমাদের কথা মতো গত পুজার ছুটিতে ওরা আসেও। ওরা এলে আমরা খুশি হই- মঞ্জুর ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, তারপর স্বভাব চরিত্র খুবই ভদ্র- তবে আমার ওয়াইফ ওদের নিয়ে তেমন হৈ চৈ করেনি, বরং যতখানি সম্ভব মঞ্জুরের আসল পরিচয়টা গোপন রাখতো, যদিও মেয়েকে খোলাখুলি কিছু বলেনি- তখন পূজা এসে গেছে। আর তুই তো জানিস নিশ্চয়ই যে দুর্গাপূজার আগে পরেও অনেক পূজা আছে- আর প্রত্যেকটা পূজার নানান রকম রিচুয়ালস্ আছে- তো ওই সব পূজার অনুষ্ঠানে মঞ্জুর যাক, এটা বিন্দু, মানে আমার ওয়াইফ, পছন্দ করতো না, যদিও মুখে কখনো কিছু বলে নি। কিন্তু না বললে কী হবে, মেয়ে ঠিকই টের পেয়ে গিয়েছিলো- একদিন এক পূজোর অনুষ্ঠানে যেতে বারণ করলে মেয়ে রেগে যায়। যদিও তখন তখনই মুখে কিছু বলে না। তার কদিন পর আবার এক পুজো বোধহয় ষষ্ঠী পুজোর অনুষ্ঠানে আমার বোনের বাড়ি থেকে নিয়ন্ত্রণ আসে- আমার বোনের ফ্যামিলি আবার খুবই কনজারভেটিভ - তবু হাজার হলেও পিসীর বাড়ি! ভাইঝি তো যেতে চাইবেই। মেয়ে যায়, জামাইকে নিয়েই মায়ের সঙ্গে যায়- কিন্তু ওর পিসীর শাশুড়ি পুজোর ঘরে মঞ্জুরকে ঢুকতে দেয় না- শাহিদ হাসান হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান ছেলের বিয়ে- পরবর্তী সমস্যার কাহিনী মন দিয়ে শুনছিলেন। বলতে বলতে ওদিকে হঠাৎ বন্ধু থেমে গেলে বলে ওঠেন, তাহলে থামলি কেন? তারপর বল, কি হলো?

বলার কিছু নেই, দিব্যেন্দু লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন। বলেন, মেয়েটা আমার এমনিতে দেখতে সুন্দর, আবার শান্তশিষ্টও। কিন্তু হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ও ভীষণ জেদি। ও মায়ের নিষেধ না শুনে লক্ষ্মী পুজোর দিন স্বামীকে নিয়ে মামার বাড়িতে যায়। ওখানেও মঞ্জুরকে ঢুকতে তো দেয়ইনি, এমন কি মন্দিকেও না- ওর মাসীটা ভীষণ গোঁড়া, আবার গোঁয়ারও। ব্যস, মেয়ে ক্ষেপে যায়। বাড়িতে এসে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। আমাকে বলে, তোমরা আমার স্বামীকে অপমান করেছো, মা পিসীমার বাড়িতে যাবার দিন সঙ্গে ছিলেন, মামার বাড়িতে তো পাশেই ছিলেন, একটা কথাও বলেন নি।

ওই রকম রাগারাগি করে স্বামীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়- শত ডাকাডাকিতেও দরজা খোলে না। পরের দিন সকালে দরজা খুলে ব্যাগ-স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে শুনেছি ওরা গিয়ে এক হোটেলে উঠেছিলো, একদিন সেখানে থেকে তার পরদিন লন্ডনে ফিরে যায়। ওরা যাবার দু'দিন পর মন্দির একখানা চিঠি পাই। তাতে লেখা, ও আর কোনোদিন আমাদের কাছে আসবে না -বাবা মায়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক ও ত্যাগ করেছে- ওর সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগের চেষ্টা আমরা যেন না করি-

এই পর্যন্ত বলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে আবার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন দিব্যেন্দু। তারপর জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন, মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না।

শাহিদ হাসানও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বাল্যবন্ধুর করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলবার মতো কথা খুঁজে পান না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে, দেয়ালের ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা ৬টার দাগ ছোঁয়-ছোঁয়। সূর্য ডুবে না গেলেও বাইরে রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে তখন।

শাহিদ হাসান বসিরনকে ডাকেন। তারপর বন্ধুকে বলেন, সন্ধ্যা হয়ে এলো, চা খাবি, না কফি?

নাহ্ কিছু না, দিব্যেন্দু মাথা আর হাত নাড়াতে নাড়াতে বলেন, ওসব কিছু লাগবে না- আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না যখন মন্দির কথা স্মরণ হয়।

শাহিদ বসিরনকে ডেকে চা-বিস্কুট দিতে বলেন। তারপর বন্ধুকে জানান, দেখ, আমি এখন একা থাকি- বউ যে মরে গেছে সে খবর তো নিশ্চয়ই তোকে নাহিদ জানিয়েছে। মুকুল, মানে আমার মেয়ে, ওর সঙ্গে থাকি- ও বাচ্চা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি গেছে ছুটি কাটাতে, মনে হয় ওর ফিরতে দু'চার দিন দেরি হবে- তুই আমার এখানে থাকতে পারিস- দু'জনে মিলে ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে- বুঝিসই তো ব্যাপারটা নেহাতই সেন্টিমেন্টের, আবার ডেলিকেটও- তাড়াহুড়া করে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে আর তাতে তোদের কষ্ট আরো বাড়বে, তুই বরং এখানেই চলে আয়।

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ায়। বলে, না ভাই এখানে থাকতে পারবো না- তাহলে বিধান আর ওর বউ রাগ করবে। তাছাড়া তোকে বললাম তো বিন্দু ওদিকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আর ওখানকার বাড়ির জমির সীমানা নিয়ে একটা ঝামেলাও বেধে আছে- তুই কি মনসুর সাহেবের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখবি?

কী আলাপ করবো? শাহিদ ঠিক বুঝতে পারেন না। বলেন, ব্যাপারটা তো একেবারেই ব্যক্তিগত, সম্পূর্ণ ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। সে ক্ষেত্রে কথাটা তুললেই মনসুর যদি মাইন্ড করে? মুখের ওপর বলে দেয় যে ও ব্যাপারে সে আলাপ করতে চায় না, তখন কী বলার থাকবে আমার, তুই-ই বল?

না, অমন কিছু হবে না, দিব্যেন্দু বলেন, শুনেছি মানুষটা খুবই ভালো, তুই শুধু একটু অনুরোধ করবি- উনি যেন ছেলে আর ছেলের বউকে বুঝিয়ে বলেন, মা বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা যেন ওরা রাখে- শুনেছি উনি মন্দিকে খুব ভালোবাসেন- ওঁর কথা মন্দি শুনবে- শুধু বলবেন, বছরে দু'একবার যদি ঢাকায় আসে। তখন যেন কোলকাতায়ও যায়, মা বাবার সঙ্গে দেখা করে ওঁরা মানে মনসুর সাহেব আর তাঁর স্ত্রী এমন মানুষ যে ওদের তুলনা হয় না- মন্দির মুখেই শুনেছি, ওরা ছেলের বউকে একেবারে বুকে টেনে নিয়েছেন- খুবই লিবারেল, এখন পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করেন নি যে ছেলে আর তার বউয়ের বিয়ে ইসলামী শাস্ত্র মতে হয়েছে কি না, কিংবা মন্দি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কি না- বউকে দু'জনেই মা বলে ডাকেন, প্রথম সাক্ষাতেই শাশুড়ি তার সব গয়না নিজের হাতে মন্দিকে পরিয়ে দিয়েছেন, এ রকম অনেক খবর আমি মেয়ের কাছ থেকে শুনেছি।

ওই সব সেন্টিমেন্টাল আচরণের কথা শুনে শাহিদ হাসেন বলেন, এসব তোকে বাড়িয়ে বলেছে- গোঁড়ামি কম বেশি সবার মধ্যেই আছে, হিন্দু-মুসলমান বলে কথা নয়- আমার এই বাড়ির দু'বাড়ি পরের বাড়িতে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো বলে ছেলেকে বাড়ি থেকে বাবা-মা তাড়িয়ে দিয়েছে, শেষে ছেলে আর দেশে থাকেনি, হিন্দু মেয়েটাকে বিয়ে করে বিলেতে চলে গিয়ে সেখানেই ঠাঁই গেড়েছে- বাবা মায়ের কাছে আর আসে না।

শাহিদ হাসানের কথা দিব্যেন্দুর কানে যায় কি না বোঝা যায় না। তাঁর মুখের অসহায় ভাবটা আরো গাঢ়তর হয়। বলেন, কিন্তু আমি কি করবো, তুই বল? মেয়ে ঢাকায় এসেছে, পাশেই, কলকাতা, প্লেনে চেপে গেলে আধ ঘণ্টাও লাগে না- তবু অসুস্থ মাকে চোখের দেখাটাও দেখতে যাবে না? মা মরণ শয্যায় শুয়ে পথ চেয়ে আছে, তবু মেয়ে চোখের দেখাটাও দেখতে যাবে না? এমন কষ্ট কি সহ্য করা যায়?

শাহিদ হাসান কী ভাবে বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। বলেন, তোরা কেন অতো ছেলেমেয়ের কথা ভাবিস? কোনো লাভ নেই যে কষ্টের কথা বলছিস, ধরে নে ওটা জীবনেরই অংশ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে এখন ওরা নিজেদের জীবন নিজের নিজের পছন্দ মতো গড়তে চায়। ওদের যা পছন্দ তাই ওরা করছে। তোর মেয়ে না হয় মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে, কিন্তু ছেলেটা তো বাঙালি-ই। কিন্তু আমার কথা চিন্তা কর, আমি তোকে বলিনি এখনো যে আমার অবস্থাও তোর মতোই- ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, কুয়েতে চাকরি করতে গিয়ে একটি খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করে- মেয়েটি শুধু খৃষ্টানই নয়, সে আবার ফিলিপিনো, সেই বিয়ে টিকে আছে, দিব্যি সুখে ঘর করছে ওরা- কতো বছর হলো দেখা হয় না- মাঝে মধ্যে ফোন করা পর্যন্তই সম্পর্ক। আমার স্ত্রী মারা যাবার সময়ও ওরা কেউ কাছে ছিলো না- ভেবে দেখ, ওদের গড়ে তোলা সংসার ফেলে রেখে আমার কাছে চলে আসবে, এমন আশা করাটা কি ঠিক।

কিন্তু আমি তো ওদের আসতে বলছি না, এসে থাকতেও বলছি না, শুধু বলছি বাবা মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন রাখে, বল তুই এটা কি আমাদের খুব বেশি চাওয়া?

দিব্যেন্দু আবার বলেন, মেয়ে ঢাকায় এসেছে বলে ওর মা মেয়েকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে- কিডনির রোগী -তুই শুধু একবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখ না, মনসুর সাহেব নিশ্চয়ই কোনো রকম কিছু একটা করবেন মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে।

শাহিদ হাসান বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী বললে বন্ধুর অস্থির আর স্নেহকাতর মন শান্ত হবে বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারছেন, দিব্যেন্দুর সমস্যাটার সুরাহা হওয়ার জন্য কিছুটা সময় দরকার। নিজের ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বোঝেন যে, বাবা মায়ের সঙ্গে সন্তানের বোঝাবুঝির ফারাক যতোই থাক, শেষ পর্যন্ত তা মিটে যায়। সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়- বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। দিব্যেন্দুর মেয়ের সম্পর্কে যা শুনলো, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মেয়েটা কিছু বেশি আদুরে, আবার একই সঙ্গে বেশ জেদীও। তাতে তাঁর অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে ও মেয়ের মন থেকে মা বাবার জন্য টান একেবারে উঠে যাওয়ার কথা নয়- ওর মনে ভালোবাসার কোনো রকম কমতি নেই- বরং মনে হয় একটু বেশি রকমই আছে না হলে বিদেশ বিভুঁইয়ে একটা ভিন্ন ধর্মের ছেলেকে অল্পদিনের পরিচয়ে অমন করে মা বাবার মত ছাড়াই কিভাবে বিয়ে করে?

তাঁর মনে হয়, মন্দিরার মনে মা-বাবার জন্য ভালোবাসা ঠিকই রয়ে গেছে। আর সেটা আছে বলেই এক সময় তার মনের ক্ষোভ আর জেদের ওপর মমতার আস্তরণ জমতে শুরু করবে- আর তখন সন্তান আর মা বাবার সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

এখন শুধু দরকার সময়ের আর অপেক্ষার।

বন্ধুকে কিভাবে ব্যাপারটা বোঝাবেন ভেবে পান না। শুধু বলেন, আচ্ছা, সরাসরি মেয়ের শ্বশুর বাড়ি গেলে কি সেটা ভালো হবে বলে মনে হয় তোর?

তাই তো মনে হয়, দিব্যেন্দু বলেন, তাছাড়া আর কি উপায়, বল তুই? একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি। বিভু বহু কষ্টে ঠিকানা আর ফোন নাম্বার জোগাড় করে পরশু দিন ফোন করেছিলো দুপুর বেলার দিকে- মন্দি'র সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলো- কিন্তু ও তখন বাড়িতে ছিলো না, ফোন ধরেন প্রফেসর মনসুর, উনি জানান ওরা দুজনেই তখন নাকি বাইরে গেছে।

বিভু জানিয়েছিলো যে তুই ঢাকায় এসেছিস?

হ্যাঁ, আমার সামনেই তো ফোন করে বিভু, দিব্যেন্দু বলেন, হ্যাঁ খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, মন্দিরাকে বলবেন, ওর বাবা ঢাকায় এসেছেন- তারপর বিধানের বাসার টেলিফোন নাম্বার ঠিকানা সবই জানিয়ে দেয়। ভদ্রলোক নাকি জবাবে শুধু বলেছিলেন যে উনি খবরটা মন্দিরাকে জানাবেন ওরা বাড়ি ফিরলেই।

আমি সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত টেলিফোন সেটের কাছে ছিলাম, কিন্তু মন্দি ফোন করেনি, মঞ্জুরও না। গতকাল সারাটা দিন অপেক্ষা করতে করতে কেটেছে আমার। শেষে মনে হয়েছে, মেয়ের রাগ এখনো পড়েনি। আজ সকালে আবার টেলিফোন করে বিভু- এবার এক মহিলা নাকি টেলিফোন ধরে বলেন যে রং নাম্বারে ডায়াল করা হয়েছে- কথাটা বলেই রিসিভার রেখে দেন। বিভু মন্দিরার গলার স্বর চেনে না কিন্তু আমার মনে হয়, ফোনটা তুলেছিলো মন্দিরাই, ও-ই কথা বলতে চায়। আর তাতেই আমার মনে হচ্ছে, এটা ওর শুধু রাগের ব্যাপার নয়, এটা ওর একটা সিদ্ধান্তই। শুধু ইমোশন নয়, একটা ডিসিশন ওর- আসলেই ও মা-বাবা আর নিজের অতীতকে ত্যাগ করেছে, যখন থেকে এই রকম চিন্তা মাথায় আসছে তখন থেকে আমার মন আর শান্ত হচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়েছি- বল, কেমন লাগে চিন্তা করলে-

আবেগে দিব্যেন্দুর গলার স্বর ভেঙে পড়ে, প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠেন তিনি।

অমন অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথা শেষ করার জন্য আবার বলতে শুরু করেন। বলেন, শেষে আজ সকালের দিকে বিভুই মোহাম্মদপুরের সলিমউল্লাহ রোডে যায়- মনসুর সাহেবকে পায়নি, কাজের একটা ছেলেকে নিজের পরিচয় জানিয়ে বলে যে আমি ওকে পাঠিয়েছি কিন্তু তারপরও মন্দি ওর সঙ্গে দেখা করেনি- মঞ্জুর বোধহয় বাড়িতে ছিলো না- ওর মা গলা উঁচিয়ে ছেলের বউকে ডেকেও ছিলেন, তারপরও মন্দি বিভুর সামনে আসে নি। বিভুর ধারণা, ও তখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলো।

ওই সময় বসিরন ট্রেতে করে চা বিস্কুট নিয়ে আসে। ততক্ষণে দিন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। নোনতা বিস্কুট আর চায়ের কাপ সুদ্ধ ট্রেটা টেবিলে এনে রাখলে দিব্যেন্দু বলেন, এসব আবার কেন নিয়ে এলো- আমি তো বললাম। এখন মুখে কিছু উঠবে না আমার।

আহা, প্রথম এসেছিস আমার বাড়িতে, মুখে কিছু দিবি না? তাই কি হয়!

দিব্যেন্দু কথা না বাড়িয়ে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে তারপর কয়েকটা চুমুক দেন। তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে বলেন, শাহিদ আমার মনের অবস্থাটা তোকে বোঝাতে পেরেছি কি না বুঝতে পারছি না- তুই-ই বল কী করবো আমি, তুই কিছু একটা কর, যদি পারিস।

শাহিদ হাসান বন্ধুর মুখে অমন কথা শোনার পরও চুপ করে থাকেন। কী বলবেন, ভেবে পান না। তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই যে মন্দিরা যা করেছে সেটা বাড়াবাড়ি এবং অন্যায়ও- আত্মীয় স্বজনরা কী করবে না করবে তার জন্য মেয়ে বাবা মাকে কেন দায়ী করবে?

সমাজে যা চলে না সে সব কেন চালাতে গিয়েছিলো মন্দিরা?

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে তার সেই সঙ্গে হাসিও পায়। কোরবানির ঈদের ছুটির পর মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে এক বেঞ্চে হিন্দু ছেলেরা বসতো না। আরও মনে পড়ে দিব্যেন্দুর বড় ভাই অর্ধেন্দু দা'র কথা। ঈদের দিন প্রায় মধ্যরাতে লুকিয়ে এসে বসতো বড় ভাইয়ের পড়ার টেবিলে। সেখানেই তাকে আপ্যায়ন করা হতো বিরিয়ানি পোলাও খাসির কোপ্তা, মুরগা মুসাল্লাম, টিকিয়া কাবাব, এসব খানা অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খেতো অর্ধেন্দু দা। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সেই মধ্যরাতে বড় ভাই বন্ধুকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতো।

ওসব হাসির কথা মনে পড়লেও মন্দিরার আচরণে তাঁর মন সায় দেয় না। মেয়ে তো বয়সে একেবারে ছোটটি নয়। তিন বছর আগে যে মেয়ে এসএসসি পাস করেছে, সে কি অবুঝ মেয়ে হতে পারে? আর মঞ্জুরও বা কেন ওই পূজার অনুষ্ঠান গিয়েছিলো? এক বছর পর যে এম আরসিপি ডাক্তার হবে, সে কেন পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কাজ করবে না? তাছাড়া নিজের শিক্ষিত বউকেই বা কেন সে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে নি?

চা খাবার সময় কিছুক্ষণ কথা না হলে কী হবে, মগজের ভেতরে তখন নানান চিন্তা ঘোঁট পাকায়। শেষে শাহিন হাসান বন্ধুকে বলেন, মনসুর সাহেবকে কিছু বলার আগে বোধহয় মঞ্জুরের সঙ্গে কথা বলাটা উচিত হবে।

যুক্তিটা তিনি একটু ব্যাখ্যাও করেন। বলেন, আমি যদি মেয়ে জামাইকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি শ্বশুরকে ব্যাপারটা জানাতে যাই, তাহলে মেয়ে জামাই দু'জনেই ক্ষেপে যেতে পারে। তখন যদি ওরা বলে এটা আমাদের দাম্পত্য জীবনের ব্যাপার- স্বামীর মান সম্মান রক্ষার ব্যাপারটা তো দাম্পত্য জীবনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে- ও ব্যাপারে প্রথমে আমাদের সঙ্গে কথা না বলে, আমাদের মা বাবার সঙ্গে কেন কথা বলতে এসেছেন?

তাছাড়া শাহিদ হাসান আবার বলেন, মনসুর সাহেবও তো একই কথা বলতে পারেন যে, আপনি আমাদের ফ্যামিলির ইন্টারনাল ব্যাপারে কেন নাক গলাতে চাইছেন?

তাহলে কি আমি কিছুই করবো না? এটা তুই কেমন কথা বলিস।

বন্ধুর ক্ষুব্ধ অথচ অসহায় স্বরের কথা শুনে শাহিদ হাসান মুশকিলে পড়ে যান। তবু বলেন, মনসুর সাহেব তো তোর বন্ধু নয়, তুই কী ভাবে তাঁর কাছে তোর মনের কথা বলবি? মঞ্জুর তো তোর আত্মীয়, শুধু আত্মীয় নয় বলতে গেলে পরিবারের লোক। আত্মীয় বন্ধুর কাছেই তো মানুষ সুখ দুঃখের কথা বলে, সেইভাবেই তুই প্রথমে ওকে বলবি, এই ভাবেই ব্যাপারটা আরম্ভ হতে পারে- মাঝখানে যদি মন্দির শ্বশুর বা শাশুড়ি এসে পড়েন। তাহলে তো ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যায়- একই মিটিংয়ে সমস্যার একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু তাঁর চশমা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, তুই যেভাবে ভালো হবে বলে মনে করিস, সে ভাবেই কাজটা কর ভাই। শুধু আমি যেন মেয়েটাকে না হারাই- আমাদের মনে বড় কষ্ট, এই কষ্ট পেতে পেতে বিন্দু বোধ হয় মারাই যাবে।

তুই-ই বল কী করবো আমি এখন? দিব্যেন্দু আবার জানতে চান। বলেন, 'মন্দির শ্বশুরের কাছে কাউকে পাঠাবো না? নাকি আমি নিজেই গিয়ে হাতে পায়ে ধরবো?'

আরে নাহ্, শাহিদ হাসান বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, এতো ভেঙে পড়ছিল কেন? ঢাকায় এসেছিল যখন একটা কিছু উপায় অবশ্যই বের হবে, বিভুর আসার সময় হয়ে এলো, এখন তো সবে সন্ধ্যা ও আসুক ও-ই আমাদেরকে মোহাম্মদপুর নিয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। দেখেন গেটের পরে ছোটখাটো একটা লন মতো খোলা জায়গা। সেখানে এক পাশে বকুল গাছ, অন্যপাশে কলকে গাছ, দেয়ালে মাধবী লতাও আছে। গাঁদা ফুলের ঝাড়ও দেখতে পান কয়েকটা। দেখতে দেখতে জানতে চান তোর ফুলের বাগানটা তো ভালোই, কে করেছে এমন সুন্দর ফুলের বাগান? তুই?

আরে আমি কী ভাবে করবো? শাহিন হাসান জানান। বলেন, ওসব

আমার বউয়ের কাজ, আমার সময় কোথায়? আগে মা দেখাশোনা করতো এখন মেয়ে করে। মুকুলই মায়ের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

দিব্যেন্দু বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়ান- তারপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ ওপর নিচ করে দেখেন। শেষে বলেন, তোর খুব কষ্ট তাই না?

হ্যাঁ, কষ্ট তো হবেই। শাহিদ স্বীকার করেন।

বউকে খুবই ভালোবাসতিস?

বন্ধুর মুখে ওই প্রশ্ন শুনে শাহিদ আবার হাসেন। ভাবতে চান, তুই কেমন করে বুঝলি?

বুঝলাম তুই যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করিসনি, সেটা দেখে, যখন বউ মারা যায় তখন কতো বয়স? ষাট হয়েছিলো?

প্রশ্নটা বহুবার শুনতে হয়েছে এবং এখনও হয়। শাহিদ হাসান আজকাল বিরক্তি বোধ করেন অমন প্রশ্ন শুনে। বলেন, ষাট পুরোপুরি হয়ে যায়নি, তবে হবে হবে করছিলো-

তাহলে? দিব্যেন্দু চোখে চোখে তাকান।

তাহলে কী? শাহিদ পাল্টা প্রশ্ন করেন।

বিয়ে করিস নি কেন? ষাট বছর না হলে এমন কিছু বেশি নয় বয়স। তবু কেন বিয়ে করলি না।

বাহ কেন করবো? শাহিন প্রায় ধমকে ওঠেন বলেন, কী সব বাজে কথা বলিস। এবার দিব্যেন্দু একটু বোধ হয় হাসেন। অন্ধকারে সেই হাসি দেখা না গেলেও গলার স্বরটা খুব স্পষ্ট শোনায় আর সেই স্বরে কৌতুকের ছোঁয়াও যেন একটু থাকে। বলেন, সেই জন্যই তো প্রশ্নটা করেছি। দেখতে চাইছিলাম দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা বললে তুই রেগে যাস নাকি, আগ্রহ দেখাস? এখন যা বোঝার বুঝে নিলাম, আর কখনো তোকে অমন প্রশ্ন করবো না।

তো কী বুঝলি? শাহিদ প্রশ্নটা না করে পারেন না।

বুঝলাম, দিব্যেন্দু বলেন, তুই বউকে খুব ভালোবাসতিস, তোর মনে সেই ভালোবাসা এখনও রয়ে গেছে।

কী যে বলিস না! শাহিদ যেন বিরক্ত হন বন্ধুর মুখে ওই কথা শুনে। বলেন, তোর জ্ঞান বুদ্ধি আর কবে হবে? মনের ভালোবাসা মনে রয়ে যাবে না তো কোথায় পালিয়ে যাবে? নাকি পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাবে! কী যে সব উদ্ভট চিন্তা করে মানুষ- স্নেহ মমতা প্রেম ভালোবাসা এসব যে কীভাবে মনে জন্ম নেয় আর কীভাবে সারাটা মন অধিকার করে রাখে তার হদিস কেউ বলতে পারে না- এসব আবেগ আর অনুভূতি প্রায় সবার মনে থেকে যায়, কারও মনে বেশি কারও মনে কম- সেই জন্যই তো আমার বিশ্বাস, তোর মেয়ে মন থেকে বাবা মাকে ত্যাগ করেনি ও কাজ ও করতে পারে না। ভালোবাসা দিয়ে যে সারা জীবনের জন্য একজন সঙ্গী বেছে নিতে পারে- সে ভালোবাসাকে কীভাবে ত্যাগ করবে? মা বাবা আর সন্তানের ভালোবাসা যে মন থেকে জেগে ওঠে, সেই একই মন থেকে তো জীবন সঙ্গীর জন্য ভালোবাসার জাগরণ আর উচ্ছ্বাস- খামাখা অতো চিন্তা করিস না, মেয়েকে তুই হারাবি না।

বন্ধুর মুখের ওই আশ্বাসবাণী শুনে স্থির হয়ে যান দিব্যেন্দু, যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন- বাল্যবন্ধুর মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথাগুলো তার বিশ্বাস হতে চায় না, পাশাপাশি তার মনে ধর্মের কথা সাড়া তোলে, দেববাণী যেন শুনতে পান। দেবমূর্তির অস্পষ্ট ছায়া মনের পটে ভাসে।

তবে সংস্কার বলে একটা ব্যাপার আছে বুঝলি? শাহিদ আবার বলেন, ওটা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে কিন্তু সারা জীবন ধরে ওটা পারে না। কারণ মন তো পরাধীন, শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে না।

দিব্যেন্দু একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন আর বন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত কথা শোনেন, মনের ভেতরে প্রশ্ন- তখনই কেউ যেন প্রশ্ন তোলে, মন পরাধীন কি থাকে? নাকি থাকে না?

মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গটা বোধহয় আরও কিছুটা এগুতো কিন্তু তা হলো না। কারণ ততক্ষণে দিব্যেন্দুকে নেওয়ার জন্য বিভুরঞ্জন এসে গেছে- তার গলার ডাক এবং দরজায় লাগানো কলিং বেলের আওয়াজ বারবার শুনতে পাওয়া যায়।

বিভু এসে বসে এবং প্রশ্ন করে, কী হলো? কী করতে হবে তার কোনো সিদ্ধান্ত কি হয়েছে?

তার প্রশ্নের জবাব সরাসরি কিন্তু দিতে পারেন না। দিব্যেন্দু পাশে বসে যা যা আলাপ হয়েছে সব খুলে বলেন, শাহিদ হাসান যে মনসুর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে শুধু বেয়াইর সঙ্গে নয়, জামাইর সঙ্গেও আলাপ করতে চান সেই কথাও বিভুরঞ্জনকে জানান। মন্দিরার শ্বশুরকে কিছু বলার আগে তার স্বামীকে কেন বিষয়টা জানানো বেশি দরকার, সেই যুক্তিটাও বুঝিয়ে বলেন।

ওই সময় আবার চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হয় বসিরন। চা খেতে খেতে আরও কথা হয়- সব কথা দিব্যেন্দুই বলেন। শুনতে শুনতে হুঁ হাঁ বলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কয়েক বারই বিভু শাহিদ হাসানের দিকে তাকায়, আর প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করে, ধীরে প্রশান্ত মুখ অসম্মতির কোনো ছায়া সেই মুখে পড়ছে না, বরং একেকবার সমর্থনের স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটছে।

চা খাওয়া শেষ হলে বিভু উঠে দাঁড়ায়। তারপর টেবিলে রাখা ব্যাগটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে বলে, তাহলে আর দেরি কেন, আমরা তো আজই যেতে পারি- এখনই রওনা হওয়া যায়, রাত এখনও পুরোপুরি নামে নি এখনও সন্ধ্যা ফুরোয় নি ঘড়িতে দেখুন সবে সাতটা বেজেছে।

শাইদ হাসানের তৈরি হয়ে নিতে দেরিয়ে হয় না। ঘরদোর দেখেশুনে রাখার জন্য রোজ যা বলেন তা বসিরনকে বলে সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তায় নামার পর বাহন পেতেও দেরি হয় না। বলা যায় বাড়ির গেটের সামনেই একখানা সিএনজি অটো পেয়ে যান।

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে পড়তে হয় দুবার তবু আটটা বাজার বেশ আগেই মোহাম্মদপুরের সলিমউল্লাহ রোডের বাড়িটাতে পৌঁছে যান।

বাড়িটা ছোটখাটো তবে দোতলা, সামনে ছোটখাটো লন মতো, দুপাশেও জায়গা দেখা যায়, এবং গাছও। তবে কী গাছ তা অন্ধকারে চেনা যায় না। বাড়ির পুরো চেহারাটা বাইরে থেকে যা নজরে পড়ে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাড়ির মালিক হঠাৎ গজানো কোনো নব্য ধনী নয়, বাড়িটার মালিক কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক।

গেটে তালা ছিলো না। তাই গেট ছাড়িয়ে লন পার হয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজায় লাগানো কলিং বেল টিপলে একটি অল্পবয়সী সম্ভবত কাজের ছেলে এসে দরজা খুলে নাম পরিচয় জানতে চায়। তখন শাহিদ হাসান পাল্টা জানতে চান প্রফেসর মনসুর হোসেনের ছেলে ডাক্তার মঞ্জুর হোসেন বাড়িতে আছেন কি না।

ছেলেটি মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, না উনি বাইরে গেছেন।

তাহলে প্রফেসর সাহেব কি আছেন?

জি আছেন, ছেলেটি মুখোমুখি তাকিয়ে জানায়।

তাহলে তাকে খবর দাও যে সাংবাদিক শাহিদ হাসান এসেছেন, প্রফেসর মনসুর হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চান।

ছেলেটি ভেতরে গিয়ে কী বলে কে জানে, হঠাৎ দেখা গেলো নিচের তলার সবগুলো বাতি, ভেতরের বাইরের সব এক এক করে জ্বলে উঠতে লাগলো। ছেলেটি আবার এসে বসার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললো, আপনারা ঘরে এসে, বসেন, উনি এখনই আসছেন।

খবরটা জানিয়েই ছেলেটি আবার ভেতরের দিকে চলে যায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ লোককে দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। শাহিদ হাসানের চিনতে অসুবিধা হয় না- মাথার চুল, গোঁফ দুই-ই পাকা, দাড়ি নেই। তখনকার মতোই শরীরের গড়নও প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। কোমরে সম্ভবত সামান্য স্ফীতি হয়ে থাকতে পারে।

শাহিদ হাসান হাতে হাত মেলাতে মেলাতে বলেন ভালো আছেন? মনসুর তাঁর পুরু কাচের চশমা লাগানো চোখ দিয়ে অতিথির মুখের ওপর নজর রেখে বলেন, সাংবাদিক হাসান কোথায়?

শাহিদ হাসান কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক অকারণে হাসেন আর বলেন, জানেন জাহিদ সাহেব, ছাত্র জীবনে শাহিদ হাসান নামে একজনকে চিনতাম। বন্ধুই বলতে পারেন। পরে শুনেছি ও নাকি সাংবাদিক হয়েছে। তারপর আর দেখা হয়নি। কোন কাগজে আছে জানি না, অবশ্য খোঁজ করতেও কখনো যাইনি কিন্তু এখন এই বয়সে ওর কথা, মানে শাহিদ হাসানের কথা খুব মনে পড়ে, আপনি জানেন ও কোন কাগজে আছে?

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভদ্রলোক চোখে খুবই কম দেখেন, কানের অবস্থাও বোধ হয় ভালো নয়। শাহিদ হাসানের খুব খারাপ লাগে। দেরি না করে নিজের পরিচয়টা জানিয়ে দেন। বলেন, মনসুর, আমিই সাংবাদিক শাহিদ হাসান, ঢাকা হলে পাশের রুমে থাকতাম।

সে কি! মনসুর প্রায় চমকে ওঠেন। বলেন, সে কি! কিন্তু ও মানে ওই ছেলেটা যে বললো জাহিদ হাসান নামে একজন সাংবাদিক-

ও ভুল শুনেছে, শাহিদ হাসান জানান। তারপর খুবই আন্তরিক ভাবে বলেন, আমার বহুদিনের ইচ্ছা আপনার সঙ্গে দেখা করবো, কিন্তু নানান

ঝামেলা থাকার জন্য সময় করে উঠতে পারিনি- আজ একটা পেয়েছি, তাই চলে এলাম। আমার সঙ্গে ইনি হচ্ছেন, আমার কনিগ, সিনিয়র রিপোর্টার মিস্টার বি আর গুহ, আর উনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু- কলকাতা থেকে এসেছেন- উনিও এখন রিটায়ারমেন্টে আছেন। এঁর নাম মিস্টার ডি পি সেনগুপ্ত।

মনসুর হোসেন হাসতে হাসতে বলেন, তার মানে ওয়েস্টবেঙ্গলের লোক। আমার মনে আছে, সেই সময়েই বলেছিলেন যে ওয়েস্টবেঙ্গলের মদনপুর না ওইরকম নামের একটা জায়গায় আপনাদের বাড়ি ছিলো।

মদনপুর নয়, মোহনপুর, শাহিদ হাসান স্মরণ করিয়ে দেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মোহনপুর। মনসুর হাসান যেন স্মরণ করতে পারেন। আর খুশিতে হৈ চৈ করে না উঠলেও যে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, তা বোঝা যায়। আর কী যে হয় তাঁর, উঠে আবার ভেতরের দিকে পা বাড়ান। দরজার কাছে গিয়ে, গলা উঁচিয়ে কালাম কালাম বলে কাকে যেন ডাকতে আরম্ভ করেন।

একটু পরই বোঝা যায় সেই ছেলেটিকেই ডাকা হচ্ছে, যে দরজা খুলে সবাইকে ঘরের ভেতরে বসিয়েছে। মনসুর হোসেন ছেলেটির ঘাড়ে হাত রেখে কয়েক পা সামনে এগিয়ে নিচু গলায় কিছু যেন বলতে থাকেন। বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না যে, তিনি অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলছেন। আর সেটা বুঝতে পেরেই বিভু বলে ওঠে, ওসবের দরকার নেই স্যার, আমরা একটু আগেই চা খেয়েছি-

আরও কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলো- তার আগেই শাহিদ হাসান তাকে থামিয়ে দেন। নিচু গলায় বলেন, বারণ করছো কেন, আমাদের তো একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে হবে- উনি যা করতে চান, তা করতে দাও।

দিব্যেন্দুরও একই মত। বলেন, ওঁর খুশিমতো যা করতে চান, তাই করবেন, আমরা কেন বাধা দিতে যাবো।

চা-বিস্কুট এসে যায় একটু পরই। দুই পুরনো বন্ধু এবার বসেন মুখোমুখি।

বিভু হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা স্যার, আপনারা একই ব্যাচের ছাত্র, একই হল-এ থাকতেন, তবু আপনি-আপনি করে বলেছেন কেন একে অন্যকে।

মনসুর হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, তখন ওটাই ছিলা। রেওয়াজ একই ক্লাসের একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসলেও ডাকবার সময় আপনি বলেই ডাকতে হতো- তুমি'র চল পরে হয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিভুর বোধহয় স্মরণ হয়। বলে, হ্যাঁ মনে পড়েছে এমন কথা আগেও শুনেছিলাম।

হ্যাঁ ভাই, এবার আপনার কথা বলুন শুনি, মনসুর এবার সরাসরি বন্ধুর মুখের দিকে তাকান। বলেন, এই গরিবালয়ে আগমনের কারণটা বলুন।

হ্যাঁ, কারণ তো আছেই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যে কারণে আসতে হয়েছে, সেটা বড় কারণ নয়, বরং মনে হচ্ছে আগে জানি মনসুর কেমন আছে, ওর ছেলেমেয়েরা কোথায়, ভাবি সাহেবের হাল-হকিকত কেমন।

শাহিদ হাসানোর কথা শুনে মনসুর হোসেন আবার হেসে ওঠেন। বলেন, সাংবাদিক আর উকিল একই ভাষায় কথা বলে তা আমার জানা ছিলো না- তাহলে আপনি আরম্ভ করুন আগে।

ছেলেমেলের কথা ওঠে প্রথমে। শাহিদ হাসান আমেরিকায় প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ছেলের কথা দিয়ে শুরু করেন, ফিলিপিনো পুত্রবধূ আর তাদের দুই পুত্রসন্তানের দুষ্টুমির গল্প করতেও বাদ রাখেন না। তারপর মেয়ের কথা বলেন, মেয়ে এমএ পড়তে পড়তেই বিয়ে করে নেয়- এখন এক বাড়িতেই থাকেন। স্ত্রী গত হবার পর তিনি এখন মেয়ে এবং জামাইয়ের গলগ্রহ হয়ে খুবই সুখের দিন যাপন করে চলেছেন।

শাহিদ হাসানর দুই সন্তানের বিবরণ শোনার পর মনসুর হোসেনকেও নিজের দুই ছেলের কথা বলতে হয়। প্রথমে বলেন ছোটছেলের কথা সে বছর-দুই হলো যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। তারপর বড়ছেলের কথা শুরু করেন। বলেন, ও এখন লন্ডনে থাকে, ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস করার তিন বছর পর লন্ডনে যায় এমআরসিপি করতে- এ বছরই তার কোর্স শেষ হবার কথা।

ছেলেরা বিয়ে করেছে নিশ্চয়ই? শাহিদ হাসান এবার স্থির লক্ষ্যে তার প্রশ্নের তীরটা ছোঁড়েন।

হ্যাঁ, দু'জনেই, মনসুর হোসেনের মুখে সুখী মানুষের হাসি দেখা যায়। বলেন, দু'জনেই নিজের নিজের পছন্দমতো- ছোটছেলের শ্বশুরবাড়ি যশোর শহরেই, বউমা ওখানকার এক কলেজে পড়ায়, আর বড় ছেলে বিয়ে করেছে লন্ডনে, বউমা ডাক্তার, কলকাতার মেয়ে।

বড় ছেলে কি এখন ঢাকায়? এবার প্রশ্নটা করেন দিব্যেন্দু নিজে।

প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকান মনসুর হোসেন। নতুন আগন্তুক ভদ্রলোকের প্রশ্নটা শুনে বোধহয় তাঁর খটকা লাগে। তবু উত্তরটা ঠিকমতো এবং স্বাভাবিকভাবেই দেন। বলেন, হ্যাঁ ও এখন ঢাকায়, সপ্তাহ দুয়েক হলো এসেছে, বোধহয় পুরো মাসটাই থাকবে-

কলকাতায়ও তো যেতে হবে, এবার বিভু কথা বলে। বলে, এতো কাছে এসেছেন, বাবা-মাকে দেখতে যাবেন না?

আমি ঠিক জানি না, মনসুর হোসেন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলেন। যাওয়ার তো কথা ছিলো, কিন্তু কী এক অসুবিধা হয়েছে, তাই তারিখ পিছিয়ে দিয়েছে- ছেলে একবারে বলে, খুব শিগগিরই যাবে। পরে শুনি, যেতে কিছু দেরি হবে- মনে হয় কোনো অসুবিধা হয়েছে।

মনসুর হোসেনের ওই কথার পরপরই শাহিদ হাসানের যে কী হয়, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসেন, আচ্ছা মানে আপনার বড় ছেলে মঞ্জুর কি এখন এই বাড়িতে?

হ্যাঁ, এই বাড়িতেই ও আর কোথায় যাবে? বিকেলে বউমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলো, এতোক্ষণে বোধহয় ফিরে এসেছে। কেন, ওকে কি ডাকবো? ওর সঙ্গে কথা বলবেন?

শাহিদ হাসান ক্যাবলার মতো দাঁত বের করে হাসেন। বলেন, ওকে তো কখনো দেখিনি একবার চেহারাটা অন্তত দেখে যাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি দেখছি ও ফিরে এসেছে কি না- বলতে বলতে মনসুর সাহেব আবার ভেতরের দিকে চলে যান। আর তখনই পেছন থেকে দিব্যেন্দুর বিপন্ন স্বর শুনতে পান শাহিদ হাসান। দিব্যেন্দু বলেন, এ তুই কী করলি। পরিচয় দেয়ার সময় আমার আসল নামটা অস্পষ্ট রাখলি ইংরেজি কায়দায় নাম বলে, এখন যদি মঞ্জুর এসে আমাকে এখানে দেখে, তাহলে কী ভাববে ও? আর মন্দিও কি মনে কম আঘাত পাবে? যখন দেখবে যে তার বাবা নাম-পরিচয় গোপন করে তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে- ছি ছি, এটা তুই কী করলি, কেন মঞ্জুরকে ডাকতে বললি?

আমি বরং চলে যাই- সেটাই ভালো হবে- চলো বিভু আমরা এই ফাঁকে চলে যাই, আমি পরে আসবো নিজের পরিচয়টা ফোনো জানিয়ে দিয়ে। চলো এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাই-

দিব্যেন্দু বাবু দরজার দিকে পা বাড়াল বটে, কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারেন না। কেননা তার আগেই মনসুর হোসেন ঘরে ফিরে আসেন। অতিথিকে দরজার দিকে যেতে দেখে বলে ওঠেন। আরে! কী ব্যাপার? আপনি ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

অগত্যা তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, ওই মুহূর্তে নিজেকে তার দারুণ অসহায় লাগে। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি মনসুর হোসেনের মুখোমুখি দাঁড়ান। বলেন, মনসুর সাহেব, আমাদের আপনি মাপ করে দেবেন। আমার পরিচয় দেবার সময় বন্ধু শাহিদ হাসান একটা সত্যকে কিছুটা আড়াল করার জন্য আমার নামটা ইংরেজি কায়দায় উচ্চারণ করে দিব্যেন্দু প্রসাদ সেনগুপ্ত না বলে, বলেছেন ডি পি সেনগুপ্ত।

মনসুর সাহেব দিব্যেন্দু বাবুর কথা শুনে ভয়ানক বিভ্রান্ত বোধ করেন। নামটার সঙ্গে যে তাঁর একটা পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে, সেটা তাঁর খেয়ালে আসে না। তিনি এলোমেলোভাবে বলেন, বাহ্ সুন্দর লাগছে শুনতে ঢাকায় একসময় একজন ইন্ডিয়ান হাইকমিশনার ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ডি পি ধর। খুবই ভদ্রলোক। সেই রকমই তো শুনতে সুন্দর লাগে আপনার নামটা- ডি পি সেনগুপ্ত- একই নাম শুধু পদবিটা যা আলাদা।

হ্যাঁ, তা কোথায় যেন থাকেন বললেন,? মনসুর হোসেন অল্প আগে পরিচয় দেওয়ার সময় বলা কথাটা স্মরণ করার চেষ্টা করেন। বলেন, হ্যাঁ কলকাতা থেকে এসেছেন, এবার মনে পড়েছে, তা কলকাতার কোথায় যেন থাকেন বলেছিলেন?

এবার দিব্যেন্দু বাবু কিছুটা বিস্তারিতভাবেই বলতে শুরু করেন। বলেন, আমরা এখন বাগবাজার এলাকায় থাকি, শ্যামবাজারের কাছেই জায়গাটা- শুনেছেন বোধহয়- তবে ওখানকার বনেদি লোক নই আমরা- পার্টিশনের পরপরই আমরা চলে যাই ইন্ডিয়ায়, পশ্চিম দিনাজপুরের মোহনপুরে। ওখানেই আমরা সেটল করি- ওই মোহনপুরেই ছিলো শাহিদ হাসানদেরও আদি নিবাস- ওখানে এখন আমাদের ফ্যামিলির অনেকেই বসবাস করে।

মনসুর হোসেনের মনের বিভ্রান্ত ভাবটা ততক্ষণে অনেকটা কেটে গেছে- সম্ভবত তখন মনে পড়ে যায় শাহিদ হাসানের বলা কথাগুলো। বলেন, কলকাতার বাগবাজারে থাকেন, নাম বললেন দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত তার মানে?

ব্যাপারটা তাঁর মনে তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন, কী আশ্চর্য! আপনি ঢাকায় এসেছেন, এইভাবে? আমরা কেউই জানি না- আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না, শুধু আমি কেন কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না!

তাঁর গলার স্বরে ক্ষোভ, বিস্ময়। আর কিছু খুশিও মেশামিশি হয়ে বের হয়ে আসে।

কী করবো, বলুন? দিব্যেন্দু জানান, মন যে মানতে চায় না, তার ওপর ওর মায়ের অসুখ, খুবই খারাপ অবস্থা, বাঁচবে কি না জানি না- তাই চলে এলাম-

মনসুর হোসেন কী বলবেন ভেবে পান না। শুধু বলেন, বসুন আপনি। ওরা হয়তো এখনই এসে যাবে-

তাঁরা কথা বলতে বলতেই দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া যায়। মনসুর হোসেন বলে ওঠেন, ওই যে, ওরা এসে গেছে।

একটু পরই দু'জনকে বারান্দায় দেখা যায়, আর তখন মনসুর হোসেন ডাক দেন, এই যে মঞ্জু। তোমরা এসে গেছো? এদিকে এসো, দেখো কে এসেছেন!

দুজনে পাশাপাশি দরজার কাছে দাঁড়ায়। দিব্যেন্দু উচ্ছ্বসিত ভাঙা গলায় বলে ওঠেন, মা মন্দি আমি এসেছি!

মন্দিরার ভুরু কুঁচকে ওঠে, গলার স্বর হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ? বলে, তুমি? তুমি কেন এসেছো এখানে? কে আসতে বলেছে?

রাগ করিস না মা, দিব্যেন্দু বাবু কাতর গলায় বলেন, কী করবো বল? মন যে মানতে চায় না- খবর পেয়েছি তোরা ঢাকায় এসেছিস- মা মন্দি, তুই আমার কথা একটু শোন।

মন্দিরার গলার স্বর ধারালো হয়ে ওঠে। বলে, মন্দি নামে কাকে ডাকছো? ও নামে এখন আর কেউ নেই, মন্দিরা নামেও না- যাকে ডাকছো, ও মরে গেছে- আমার নাম মেহরিন- মেহরিন মঞ্জুর- আমার সঙ্গে তোমার কোনো কথা নেই! কথাটা বলেই মন্দিরা ফুঁপিয়ে ওঠে। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

গোটা পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। মঞ্জুর এগিয়ে এসে শ্বশুরকে বলে, আপনি বাবা এভাবে হঠাৎ করে কেন এলেন? একটা খবর অন্তত জানাতে পারতেন যে আপনি আসছেন। আমরা মন্দিরাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানসিকভাবে তৈরি করে রাখতাম- ও তো আপনার কোনো কথাই শুনতে চাইলো না।

দিব্যেন্দু কিছুই বলতে পারেন না, অসহায়ের মতো শুধু ডাইনে-বাঁয়ে তাকান।

শাহিদ হাসান তখন এগিয়ে যান, বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, কেন তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছো। শান্ত হও- মনসুর সাহেব তো ব্যাপারটা বুঝেছেন, দেখে মনে হলো মঞ্জুরও বোঝে- হতাশ হাওয়ার কিছু নেই, তুমি শান্ত হয়ে বসো।

তিনি নিজেই হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে সোফায় বসান।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সবাই।

শেষে মনসুর সাহেবই ছেলেকে বলেন, তুমি ওপরে যাও- বউমাকে দেখো।

হ্যাঁ যাচ্ছি, মঞ্জুর বলে, মনে হয় ওকে নিয়ে আজ ঝামেলা হবে। সে শ্বশুরকে জানায়, মন্দিরা কলকাতা থেকে যাওয়ার পর গত কয়েক মাস ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছে- ওখানে পড়াশোনাতেও মন দিতে পারে না- খালি চুপচাপ বসে থাকে। আর কী যেন ভাবে- তাই আমরা ঢাকায় এসেছি- যাতে ও আবার তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

মঞ্জুর আবার বলে, মাঝখানে ও অনেক কান্ড করেছে। একদিন ও লন্ডনের কেন্ট এলাকার মসজিদে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারপর আমরা ইসলামের শরিয়ত মতো আবার বিয়ে করি- কারণ আগের বিয়েটা ছিলো সিভিল ম্যারেজ- সব ওর ইচ্ছা আর আগ্রহে করা হয় কিন্তু তার পরও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি ও- তাই শেষে ওকে ঢাকায় নিয়ে এসেছি- অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলো ও- কিন্তু এভাবে আপনার মুখোমুখি

হয়ে ওর মনে আবার টেনশন বেড়ে গেলো- এভাবে হঠাৎ করে আপনার আসা উচিত হয়নি। কথাগুলো বলার সময় মঞ্জুরের গলার স্বর থেকে ক্ষোভ আর বেদনা বেরিয়ে আসছিল। কথা শেষ হলেই সে এক মুহূর্ত দেরি করে না। সোজা ওপরে চলে যায়।

তারপর আবার সবাই চুপচাপ হয়ে থাকে।

তাহলে? হঠাৎ বিভু বলে ওঠে, এখন আমরা কী করবো স্যার?

ঐ প্রশ্ন শুনে শাহিদ হাসানের মুখে অনিশ্চিত হাসি দেখা যায়। বলেন, আমাদের তো আর কিছু করার নেই- দিব্যেন্দু তার মনের কথা প্রায় পুরোটাই জানিয়ে দিয়েছে- ওরও তো আর কিছু করার বাকি নেই।

সবাই তখন মনসুর হোসেনের মুখের দিকে তাকায়।

আপনি কিছু বলুন, এবার সরাসরি তাগিদ দেন শাহিদ হাসান।

মনসুর হোসেন তখন স্থির এবং গম্ভীর। বন্ধুর কথা শুনে মাথাটা খুব ধীরে ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ান, তারপর খুব লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আমি আর কী বলবো- আর করারও বা কী বাকি আছে? তবু একটু অপেক্ষা করুন, মঞ্জু ওপরে গেছে- দেখা যাক ও এসে কী বলে।

দীর্ঘ অপেক্ষা তারপর। দেয়ালের ঘড়িতে ঘন্টার কাঁটা ৯টার দাগ পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, দশটার দাগ ছুঁতেও বেশি দেরি নেই। দেখতে দেখতে দশটাও বেজে যায়। মনসুর হোসেনের বোধ হয় কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে। দু'হাতে কোমর চেপে ধরে উঠে দাঁড়ান। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, দেখি ওদিকের কী খবর।

কথাটা বলে তিনি ঝুঁকে পড়ে ধীর পায়ে দরজা পার হয়ে ভেতরের দিকে চলে যান।

তার পরও অপেক্ষা।

শেষে যাদের আসবার কথা তাদের কেউ নয়, এক প্রৌঢ়া মহিলা এসে পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ান। তারপর মুখে হাসি টেনে বলেন, আমাদের বেয়াই মশাই কোথায়?

দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। মহিলার পরিচয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। উনি যে মনসুর হোসেনের মিসেস, অন্য কেউ নন, তা সবাই বুঝতে পারে।

মহিলা বলেন, বেয়াই মশাই, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? চলুন, মেয়ের কাছে গিয়ে বসবেন- দোষ করেছেন আপনারা, তাহলে আমরা কেন মেয়ের বকাবকি শুনবো। চলুন, মেয়ের কাছে, তার বকাবকি খাবেন।

দিব্যেন্দু বাবু তাঁর রেয়াইনের হুকুম মেনে মহিলার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেন। আর এদিকে ঘরের ভেতরকার গুমোটটা ফেটে যায়। বুকের ভেতরকারে আটকে থাকা দমটাও যেন লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করে।

যাক বিপদটা বোধহয় কাটলো! বিভু মন্তব্য করেন।

এখনও কিছু বলা যায় না। শাহিদ হাসানের মনের ভেতরকার সহেন্দটা খুব ধীর স্বরে বের হয়।

কী যে বলেন, স্যার, মেয়ে আর বাবা মুখোমুখি হলে কি আর অন্য কিছু হওয়ার উপায় আছে?

ঠিক আছে, শাহিদ হাসান বলেন, দেখা যাক কী হয়- অপেক্ষা করো, দেখা যাক দিব্যেন্দু নিচে নামুক।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মনসুর হোসেনকে নিচে নামতে দেখা যায়। ঘরে ঢুকে বসতে বসতে বলেন, মেয়েদের ক্ষমতা অনেক বেশি, বুঝলেন? সংসার তো ওরাই গড়ে তুলেছে- আর সংসার গড়ে উঠেছে বলেই তো হিউম্যান সিভিলাইজেশন- তাই না শাহিদ?

হ্যাঁ, তাতে বটেই, শাহিদ হাসান সায় দিয়ে জানতে চান, কিন্তু কী হলো ওপরে, শেষ পর্যন্ত।

জানি না, মনসুর বলেন, মঞ্জুরের মা-ই ফাইনালি করণীয় কাজটা করলেন- উনি বাপকে মেয়ের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

তারপর? সবার মুখ দিয়ে শব্দটা একসঙ্গে বের হয়।

তারপর আবার কী? মনসুর বলেন, বন্ধ দরজায় কান পেতে রেখে শুধু রাগারাগি আর কান্নাকাটির আওয়াজ শোনো গেছে- এখন চুপ কোনো সাড়া শব্দ নেই- তাই আমি নিচে নেমে এলাম।

কতোক্ষণ থাকবে ওরা দরজা অবস্থায়? বিভু জানতে চায়।

তা তো জানি না মনসুর হোসেন বলেন, তবে মেয়েকে কোলে নিয়ে যদি ঘুম পাড়াতে আরম্ভ করে বাপ তাহলে তো দেরি হবেই।

তাহলে আমি বরং যাই স্যার। বিভু শাহিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলে। তুমি গেলে দিব্যেন্দুকে কে ওর বাসায় পৌঁছে দেবে?

উনি না হয় আপনার বাড়িতেই থাকবেন আজকের রাতটা। কাল সকালে চলে যাবেন বিধান কাকার বাসায়- আমি আজই ওদের জানিয়ে দিচ্ছি যে দিব্যেন্দু কাকা রাতে ফিরবেন না- পুরনো বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। আমাকে এখনই যেতে হবে। এখন গিয়ে না ঘুমালে সকালে উঠতে পারবো না। সকাল বেলাতেই আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে- আমেরিকা থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একজন ডিরেক্টর আসছেন- ওই অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টা যে হেলাফেলার নয়, শাহিদ হাসানের তা অজানা নয়। অগত্যা বলেন, ঠিক আছে। তাহলে তাই যাও- রাত তো কম হয়নি- সাড়ে দশটা বাজে।

ওই কথার পর আর বলবার মতো কিছু থাকে না। বিভু দরজা খুলে বেরুতে যাবে, ঠিক সেই সময় পেছন থেকে ডাক, বিভু তুমি কি বাসায় যাচ্ছো?

বিভুকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। সবাই দেখে দৃশ্যটা। দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনেরই চোখমুখ বেশ ফোলা ফোলা- বোধহয় বাপ-মেয়েতে মিলে কান্নাকাটির আসরটা ভালোমতেই জমিয়ে ছিলো। মেয়ে তখন মুখ নিচু করে রেখেছে।

দিব্যেন্দু বলেন, হাসান, তোমরা ভাই বাসায় যাও, আজ রাতটা আমি এখানেই, মানে বেয়াই-বেয়ানের বাড়িতে থাকবো।

শাহিদ হাসান বাপ-মেয়েকে পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায় কিছুক্ষণ দেখে। তারপর খোলা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে, যাই তাহলে মনসুর, বুড়োটাকে রেখে গেলাম- দেখে-টেখে রাখবেন।

বিদায়ের কথা কটা উচ্চারণ করে দুজনে বাইরে এসে দাঁড়ান, তারপর তারা, ভর্তি আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে খোলামেলা বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেন।